বিচার বিভাগের সংকট

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গ- নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ। এর কোনোটির অঙ্গহানি ঘটলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে কেবল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যেরই সৃষ্টি হয় না, রাষ্ট্রের ভিতটিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই তিনটি অঙ্গের নিজস্ব কার্যক্রম ছাড়াও এদের পারস্পরিক সম্পর্কটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের এই তিনটি অংশের ভারসাম্য রক্ষা করেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এগিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যটি কখনই সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেসামরিক, সামরিক উভয় শাসনামলেই নির্বাহী বিভাগই সব সময় কর্তৃত্বপরায়ণ থেকেছে। জনগণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় সংসদ তথা আইনসভাকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা হলেও, নির্বাহী কর্তৃত্বের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে আইনসভাকে এখনও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই থাকতে হচ্ছে। সংবিধানের ৭০ বিধির কারণে সংসদ সদস্যরা তাদের দ্বারা নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধান এবং ঐ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার পরও নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে এখনও পৃথক করা হয়নি। বরং নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে বারবার সময় নেয়া হচ্ছে। যার মানে হলো, বিচার বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে নির্বাহী বিভাগ সময়ক্ষেপণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ঐ বিচার বিভাগের কি পরিণতি ঘটেছে বিচার বিভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ।

নব্বই-উত্তর সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ নিয়ে বড় ধরনের টানাপড়েন চলে আসছিল। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার সুপ্রিম কোর্টের দিকনির্দেশনামূলক রায় নির্বাহী বিভাগের কখনই পছন্দ হয়নি তা সে সামরিক বা বেসামরিক যেই হোক। জেনারেল এরশাদও বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন করার জন্য সংবিধানের বিধি লঙ্ঘন করে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের নামে হাইকোর্টকে টুকরো টুকরো করে ভাগ-বিভাগ করে দিয়েছিল। আইনজীবীদের দীর্ঘ লড়াই এবং সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় সামরিক একনায়ক এরশাদের ঐ আদেশ রদ করে সুপ্রিম কোর্টকে আবার স্বঅবস্থানে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংসদে উত্থাপিত আইনকে পর পর দুইটি সংসদে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময় সুপ্রিম কোর্টই বলে দিয়েছেন যে, এ জন্য নতুন করে আইনের প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্ট নিজেই এ ব্যাপারে নির্দেশনামা প্রদান করেছেন। কিন্তু সরকার ঐ নির্দেশনামা স্বীকার করে নিয়েও এ নিয়ে কেবল পা-ই ঘষটাচ্ছে না, ঐ নির্দেশনামার বিপরীতে তাদের ইচ্ছামাফিক বিধি তৈরি করেছে। এ নিয়ে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন। ঐ বিরোধের এখনও নিরসন হয়নি।

অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের প্রশ্ন নিয়েও নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। নব্বই-উত্তর বিএনপি সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দিলে সে সময়কার প্রধান বিচারপতি তাদের শপথদান করাতে অস্বীকার করেন। আইনজীবীদের পক্ষ থেকেও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করার সাংবিধানিক রীতি লঙ্ঘন করে এভাবে বিচারক নিয়োগদানের প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীদের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন নির্বাহী বিভাগ পিছিয়ে যায় এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগের দলীয় বিবেচনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন বিচারক নিয়োগ আর যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিচারক্ষমতার ওপর নির্ভর করে হয় না, হয় দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। এই উলঙ্গ দলীয়করণ প্রচেষ্টার ফলে বিচার বিভাগকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বেশ কয়েকবারই বিশেষ সংকটের জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের দলীয় নিয়োগকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের পক্ষ-বিপক্ষের পাল্টাপাল্টি আন্দোলনের কর্মসূচিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সব সময়ই উত্তেজনা বিরাজ করেছে। এই নিয়ে বেঞ্চ এবং বারও নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে সর্বোচ্চ আদালত দলীয়ভাবে পরিচিতি পেয়েছে। এখন সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্টে বিচার চাইতে গেলে মক্কেলরা বিচারকের রাজনৈতিক পরিচয় জেনে নিয়ে সেই দলের আইনজীবীদের নিয়োগ দেন। আইনজীবীরা যেমন বিএনপি আওয়ামী লীগ বলে পরিচিত, তেমনি বিচারকরাও।

আর এই দলীয়করণের বেনোজলে সুপ্রিম কোর্টে এমন ব্যক্তিরা ঢুকে পড়ছে যাদের দক্ষতা-যোগ্যতাই নয়, সততা ও আচরণ নিয়েও প্রকাশ্যেই প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এ ধরনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আইনজীবী ও রাজনীতিকরা সংঘাতপূর্ণ বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে।

সাম্প্রতিককালে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামগ্রিক ভাবমূর্তি এবং সে সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসে বড় ধরনের চিড় ধরিয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতির সমস্যা সব সময়ই ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ঐ সমস্যা চূড়ান্ত রূপ নিয়ে এ দেশকে দুর্নীতির ক্ষেত্রে সর্বাগ্র দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত করেছে। ফলে দেশের বিচার বিভাগ

এই দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত থাকবে এটা আশা করা বৃথা। এবং দেশের অধঃস্তন বিচারালয়গুলোতে দুর্নীতির বিস্তার দুর্নীতি সম্পর্কিত সব রিপোর্টেই সব সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে সে ধরনের অভিযোগ সাধারণভাবে শোনা যেত না। দুর্নীতি এখানেও ছিল। তবে সেটা সহনীয় ও নিন্দনীয় পর্যায়ে ছিল। এবং সে কারণেই দেশের মানুষ তাদের শেষ ভরসাস্থল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টকে বিবেচনা করেছে। কিন্তু সামরিক স্বৈরাচারের যে লিগ্যাসি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনকে কালিমালিপ্ত করে রেখেছে তা থেকে বিচার বিভাগও রেহাই পায়নি। দুর্নীতিবাজ সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের মামলাকে কেন্দ্র করেই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুর্নীতির চেহারাটি প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে। জেনারেল এরশাদ তার মামলার রায় স্বপক্ষে নিতে বিচারককে যে অর্থ প্রদান করে সে বিষয়ে ক্যাসেটে ধারণকৃত টেলিফোন কথোপকথন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশ পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঐ বিচারপতি পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে ঐ ক্যাসেট-কাহিনী প্রকাশ করায় হাইকোর্ট ঐ সংবাদপত্র মালিককে অভিযুক্ত করে। ঐ ক্যাসেট কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলার বিষয়টি এখনও হাজারো মামলার ভিড়ে ধামাচাপা পড়ে আছে। সম্ভবত হাইকোর্ট তার নিজের ক্লেদাক্ত চেহারাটি প্রকাশ করতে রাজি নয়। সে কারণে ঐসব বিষয় কার্পেট চাপা দিয়ে দেয়া হয়। এখানে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভূমিকাও রহস্যজনক। তারাও আর বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায়নি। হাইকোর্টের মত তারাও মুখে কুলুপ এঁটে বসে থেকেছে।

কিন্তু পাপের ভাঁড়ায় যখন পূর্ণ হয় তখন আর সেটা লুকিয়ে রাখা যায় না। এবার যখন বিএনপির দ্বিতীয় দফার সরকার সব রীতিনীতি ভঙ্গ করে সুপ্রিম কোর্টের ছুটির একদিন আগে একসঙ্গে উনিশজন বিচারক নিয়োগ দেন, তখন আইনজীবীরা আবার নড়েচড়ে বসে। এবং এবার তাদের হাতেই হাইকোর্টের বিচারক ধরা খান। দলীয় ভিত্তিতে এভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন বিচারক রায় পাইয়ে দেয়ার আশ্বাসে তার পূর্বতন মক্কেলের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি বিষয়টি বিচার বিভাগের সততা লঙ্ঘন হিসেবে ঐ বিচারকের অপসারণ দাবি করেন। অনেক চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করেন। ঐ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ঐ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতীয়মান বলে মনে হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে বিচারকের পদ থেকে অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রপতি ঐ সুপারিশ অনুযায়ী বিচারককে অপসারণ করেন। কিন্তু হাইকোর্টের একটি বেঞ্চই প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম দু'জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ঐ অপসারণ আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। সরকারও ঐ ব্যাপারে আপিল বিভাগে যায়নি। শেষ পর্যন্ত একজন আইনজীবী পক্ষভুক্ত হয়ে আপিল করলে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এ আদেশ স্থগিত করেছে। কিন্তু বিষয়টি যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, হাইকোর্টের বিচারকদের দুর্নীতি সম্পর্কে বলা যাবে না, বিচার করা যাবে না। তার অর্থ একটি সেটা হলো সর্বোচ্চ আদালতই এখন বিচার কেনা-বেচাকে রীতিসিদ্ধ ও আইনসিদ্ধ করছে।

এই একই ঘটনা শুরু হয়েছে ঐ দলীয় আনুগত্যের বিচারে নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিচারপতি ফয়সল ইসলাম ফয়েজীর আইন ডিগ্রির সনদ নিয়ে। দেশের প্রধান সংবাদপত্রসমূহ তাদের অনুসন্ধানী রিপোর্টে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সনদ জাল সংক্রান্ত রিপোর্ট করতে গিয়ে এই বিচারপতির আইন পরীক্ষার ফলাফলের টেব্যুলশন শিটে ঘষামাজা করে পরিবর্তনের ঘটনা আবিষ্কার করেন এবং সংবাদপত্রে বড় ধরনের খবর হিসাবে সেটা প্রকাশ পায়। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির চাপের মুখে প্রধান বিচারপতি শেষ পর্যন্ত ঐ বিচারককে বিচার করা থেকে বিরত রাখতে বেঞ্চ থেকে প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ বিচারকের পিতা ঐ সংবাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করলে হাইকোর্ট মূল বিষয়ে কোনো আলোচনা-শুনানি না করেই ঐসব সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে জেল-জরিমানার রায় দেন। দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের এখতিয়ারের প্রশ্নে এই রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ঘটেছে তা হলো প্রধান বিচারপতি ঐ সনদ পাসের বিষয়টি ফয়সালা না করেই ঐ বিচারককে আবার বিচারের ভার দিয়েছেন। বার কাউন্সিল মিথ্যা তথ্য দেয়ার জন্য ঐ বিচারকের আইনজীবী সনদ বাতিল করেছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি অনড়। এখন কেবল ঐ বিচারকের বিষয়ই নয়, প্রধান বিচারপতির বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ঐ বিচারকের কোর্ট বর্জন করছে। তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে সরকারদলীয় আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতি বিক্ষোভ এড়াতে সকাল সকাল তার দপ্তরে আসছেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ছাড়বে না। তারা এখন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেই অবস্থান নিতে চলেছেন। সর্বশেষ হাইকোর্ট আবার বার কাউন্সিল কর্তৃক সনদ বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্থগিত করেছে।

সব মিলিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বড় ধরনের সংকটে রয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের পদত্যাগের ঘটনা। সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ও সরকারপক্ষ উভয়ই এই পদত্যাগকে স্বাস্থ্যগত কারণ বলে বলছেন। কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের অন্যান্য আইন কর্মকর্তারা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। তারা সভা করে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে সরকারের (দলীয়) স্বার্থ রক্ষা না করার অভিযোগ তুলেছে। অর্থাৎ ঐ প্রধান আইন কর্মকর্তাকে দিয়ে বেআইনি কাজ করানো যায়নি। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিও এবার প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেই আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে চলেছে। একদিকে নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব, সংবাদপত্রের সঙ্গে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব, বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও সর্বোপরি বিচারকদের সততা, দক্ষতা ও অবিচারকসুলভ আচরণ- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের এখন চরম নাজুক অবস্থা। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রতি জনগণের আস্থায় যে চিড় ধরেছে তাতে কেবল সুপ্রিম কোর্টই নয়, সংবিধান ও আইন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইনের শাসনের বর্তমানের বেহাল অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

সে কারণেই বিচার বিভাগের বিষয় নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল অংশকে সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ থেকেই অগ্রসর হতে হবে। বিচার ব্যবস্থার অবসানের অর্থ আইনের শাসনের অবসান। বিচার বিভাগকেও নিজেদের স্বার্থেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

একদিকে নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব, সংবাদপত্রের সঙ্গে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব, বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও সর্বোপরি বিচারকদের সততা, দক্ষতা ও অবিচারকসুলভ আচরণ- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের এখন চরম নাজুক অবস্থা। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রতি জনগণের আস্থায় যে চিড় ধরেছে তাতে কেবল সুপ্রিম কোর্টই নয়, সংবিধান ও আইন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে